**১৯৪০ সাল**

**প্রশ্ন** : পাকিস্তানের জন্মের বীজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কাকে?

**উত্তর** : পাকিস্তানের জন্মের বীজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় লাহোর প্রস্তাবকে।

**প্রশ্ন** : কত সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল লাহোর প্রস্তাব।

**উত্তর** : ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল লাহোর প্রস্তাব।

**প্রশ্ন** : লাহোর প্রস্তাব এ কি বলা হয়েছিল?

**উত্তর** : লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল।

**প্রশ্ন** : কে লাহোর প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন?

**উত্তর** : বঙ্গীয় মুসলিম লীগ নেতা এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক সম্মেলনে ওই প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন।

**প্রশ্ন** : লাহোর প্রস্তাব কি?

**উত্তর** : বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক সম্মেলনে ওই প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন। পরে ওই লাহোর প্রস্তাবই ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ হিসেবে বিবেচিত হয়।  লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব, যাকে পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণাও বলা হয়, তা হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবী জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবনা।

**প্রশ্ন** : কবে  ফজলুল হককে "শেরে বাংলা" উপাধি দেয়া হয়?

**উত্তর** : ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগের অধিবেশনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের পক্ষ হতে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রারম্ভিক খসড়া তৈরি করেন । এই সম্মেলনে ফজলুল হককে "শেরে বাংলা" উপাধি দেয়া হয়।

**প্রশ্ন** : কত তারিখ এ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুমোদন করে?

**উত্তর** : ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতীয় উপমহাদেশে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম দেশের দাবী জানিয়ে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুমোদন করে।

**প্রশ্ন** : লাহোর প্রস্তাব এ কি করা হবে বলে ঠিক করা হয়ে ছিল ?

**উত্তর** : ১৯৪০ সালে ‘লাহোর প্রস্তাব’-এ ঠিক করা হয়েছিল ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলোতে মুসলমান বেশি, সেরকম দুটি অঞ্চলকে নিয়ে দুটি দেশ এবং বাকি অঞ্চলটিকে নিয়ে আর একটি দেশ তৈরি করা হবে।

**প্রশ্ন** : লাহোর প্রস্তাব

**উত্তর** :  ১৯৪০ সালে ‘লাহোর প্রস্তাব’-এ ঠিক করা হয়েছিল ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলোতে মুসলমান বেশি, সেরকম দুটি অঞ্চলকে নিয়ে দুটি দেশ এবং বাকি অঞ্চলটিকে নিয়ে আর একটি দেশ তৈরি করা হবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যে এলাকা দুটিতে মুসলমানরা বেশি সেই এলাকা দুটি নিয়ে দুটি ভিন্ন দেশ না হয়ে পাকিস্তান নামে একটি দেশ এবং ১৫ আগস্ট বাকি অঞ্চলটিকে ভারত নামে অন্য একটি দেশে ভাগ করে দেয়া হলো।

এখন যেটি পাকিস্তান সেটির নাম পশ্চিম পাকিস্তান এবং এখন যেটি বাংলাদেশ তার নাম পূর্ব পাকিস্তান। মাঝখানে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব এবং সেখানে রয়েছে ভিন্ন একটি দেশ- ভারত।

**প্রশ্ন** : পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে বিভেদ, বৈষম্য, শোষণ আর ষড়যন্ত্র এর কারন কি?

**উত্তর** : পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে শুধু যে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব তা নয়, মানুষগুলোর ভেতরেও ছিল বিশাল দূরত্ব। তাদের চেহারা, ভাষা, খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবকিছু ছিল ভিন্ন, শুধু একটি বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলোর মাঝে মিল ছিল- সেটি হচ্ছে ধর্ম। এরকম বিচিত্র একটি দেশ হলে সেটি টিকিয়ে রাখার জন্যে আলাদাভাবে একটু বেশি চেষ্টা করার কথা, কিন্তু পাকিস্তানের শাসকেরা সেই চেষ্টা করল না। দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি, পূর্ব পাকিস্তানের ছিল চার কোটি, কাজেই সহজ হিসেবে বলা যায় শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিশ-মিলিটারি, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা সবকিছুতেই যদি একজন পশ্চিম পাকিস্তানের লোক থাকে, তাহলে সেখানে দুইজন পূর্ব পাকিস্তানের লোক থাকা উচিত। বাস্তবে হলো ঠিক তার উল্টা, সবকিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ ছিল শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ।

**১৯৪৭ সাল**

**প্রশ্ন** : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কত সালে ?

**উত্তর** : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট।

**প্রশ্ন** : কিসে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গেঁর মধ্যে সীমানা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়।

**উত্তর** : ১২ আগস্ট প্রকাশিত র্যাডক্লিপ রোয়েদাদে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গেঁর মধ্যে সীমানা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়।

**প্রশ্ন** : ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা সম্বলিত 'শ্বেতপত্র’ কবে প্রকাশ করেন ?

**উত্তর** : ৩রা জুন , ১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটেনের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সাথে এক বৈঠকে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা সম্বলিত ‘হোয়াইট পেপার' বা 'শ্বেতপত্র’ প্রকাশ করেন। ওই বৈঠকে সব দলের নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনা মেনে নেন।

**প্রশ্ন** : ‘হোয়াইট পেপার' বা 'শ্বেতপত্র’ কি ?

**উত্তর** : ‘হোয়াইট পেপার' বা 'শ্বেতপত্র’ হল ভারতবর্ষ বিভক্তির রূপরেখা । অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে শ্বেতপত্রে ভারতবর্ষ বিভক্তির রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছিল।

**প্রশ্ন** : কত সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হয়?

**উত্তর** : ১৫ ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হয়- ভারত এবং পাকিস্তান।

**প্রশ্ন** : পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান কে?

**উত্তর** : পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

**প্রশ্ন** : কত সালে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শপথ পাঠ করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ?

**উত্তর** : মুসলিম লীগের প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হন, ১৭ই অগাস্ট পাকিস্তানের করাচিতে গভর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ নেন।

**প্রশ্ন** :কত সালে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের পূর্ব পাকিস্তান সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয়েছিল?

**উত্তর** : ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের পূর্ব পাকিস্তান সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয়েছিল।

**প্রশ্ন** : আওয়ামী মুসলিম লীগ কীভাবে গঠিত হয়?

**উত্তর** : ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের পূর্ব পাকিস্তান সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু পরে মুসলিম লীগের রাজনীতির বিপরীতে ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি দল গঠনের আলোচনা, যার প্রেক্ষাপটে প্রথমে ছাত্রলীগ এবং পরে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

**প্রশ্ন** : ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট ঘটনা ।

**উত্তর** : ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়।

**১৯৪৮ সাল**

**প্রশ্ন** : কে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানান?

**উত্তর** : পাকিস্তানের বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

**প্রশ্ন** : কবে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানান?

**উত্তর** : ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ,পাকিস্তানের বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

**প্রশ্ন** : কে ঘোষণা করে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা?

**উত্তর** : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

**প্রশ্ন** : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কখন ও কোথায় ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা?

**উত্তর** : ২১ মার্চ ১৯৪৮ সালে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

**প্রশ্ন** : ১৯৪৮ সালে ২৪ মার্চ , মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কোথায় উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা , এই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন ?

**উত্তর** : ১৯৪৮ সালে ২৪ মার্চ , মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা , এই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন । অনুষ্ঠানে জিন্নাহর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কার্জন হলে উপস্থিত ছাত্রদের একটি অংশ তখনই 'নো-নো’ বলে প্রতিবাদ জানায়।

**প্রশ্ন** : ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে ?

**উত্তর** : ৪ঠা জানুয়ারি,১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

**প্রশ্ন** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের অ্যাসেম্বলি হলে নতুন প্রতিষ্ঠিত দলের নাম কি রাখা হয়?

**উত্তর** : ৪ঠা জানুয়ারি,১৯৪৮ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের অ্যাসেম্বলি হলে নতুন প্রতিষ্ঠিত দলের নাম রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ১৯৫৫ সালে এই নাম থেকে মুসলিম অংশটি বাদ দেয়া হয়েছিল।

**১৯৪৯ সাল**

**প্রশ্ন** : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় কবে?

**উত্তর** : ২৩ জুন ,১৯৪৯সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

**প্রশ্ন** : ১৯৪৯সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত দলের সভাপতি কে ছিলেন?

**উত্তর** : ১৯৪৯সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন সভাপতি,

**প্রশ্ন** : ১৯৪৯সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত দলের সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন?

**উত্তর** : ১৯৪৯সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক।

**প্রশ্ন** : ১৯৪৯সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত দলের শেখ মুজিবুর রহমান কি পদে ছিলেন?

**উত্তর** : ১৯৪৯সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত দলের শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

**প্রশ্ন** : কোথায় অনুষ্ঠিত এক সভায় গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।

**উত্তর** : ঢাকার কেএম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত এক সভায় গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রস্তাব অনুযায়ী দলের নামকরণ করা হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’।

**প্রশ্ন** : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’ এই নামকরনের কারন কি ?

**উত্তর** : ১৯৪৯সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রস্তাব অনুযায়ী দলের নামকরণ করা হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামতি কীভাবে আসে?

**উত্তর** : ১৯৪৯সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রস্তাব অনুযায়ী দলের নামকরণ করা হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’।

সেই সঙ্গে পুরো পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সংগঠনের নাম রাখা হয় ‘নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’, যার সভাপতি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে সেই দলের নাম পরিবর্তন হয়ে হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

**১৯৫২ সাল**

**প্রশ্ন** : ১৯৫২ সালে কে ঘোষণা করে যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষ?

**উত্তর** : ২৭ জানুয়ারি ১৯৫২সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

**প্রশ্ন** : সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কবে?

**উত্তর** : ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

**প্রশ্ন** : ভাষা আন্দলনের সূচনা হয় কেন?

**উত্তর** : অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে অনেক বড় নিপীড়ন হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের ওপর নিপীড়ন আর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ঠিক সেটিই শুরু করেছিল। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে আর ঠিক ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা এসে ঘোষণা করলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সাথে সাথে পাকিস্তানের বাঙালিরা তার প্রতিবাদ করে বিক্ষোভ শুরু করে দিল। আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার এবং আরো অনেকে।

**প্রশ্ন** : কত সালে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল?

**উত্তর** : ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল।

**প্রশ্ন** : ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে কোথায় ছাত্ররা একত্রিত হয়?

**উত্তর** : ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্ররা একত্রিত হয়।

**প্রশ্ন** : ২১শে ফেব্রুয়ারি,১৯৫২ সালে ঘোষণাকৃত ধর্মঘট প্রত্যাহারে কত ধারা জারি করা হয়েছিল?

**উত্তর** : ২১শে ফেব্রুয়ারি,১৯৫২ সালে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছিল। ধর্মঘট প্রতিহত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো।

**প্রশ্ন** : ভাষা শহীদের শহীদ হওয়ার কারন কি ?

**উত্তর** : ২১শে ফেব্রুয়ারি,১৯৫২ সালে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছিল। ধর্মঘট প্রতিহত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো।

সমবেত ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল নিয়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলি বর্ষণ করে; ঘটনাস্থলে আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ এবং আব্দুল জব্বার- তিনজন মারা যান। হাসপাতালে মারা যান আব্দুস সালাম।

**প্রশ্ন** : আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব কত সালে পান শেখ মুজিবুর রহমান?

**উত্তর** : আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান শেখ মুজিবুর রহমান। পরের বছর তাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকেন।

**প্রশ্ন** : ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

**উত্তর** : ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলন সেই সময়ের সংস্কৃতি,রাজনীতি, সমাজ, এবং অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে প্রতি বছর 21শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়ে আসছে বাঙালি শহীদ দিবস হিসেবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য নিচে আলোচনা করা হলো ।

প্রথমত, ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রতিষ্ঠার সংগঠিত একটি গণআন্দোলন। এটা শুধু ভাষার মর্যাদার জন্য এটি নির্মিত হয়নি। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় বাঙালিরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে বেছে নিয়েছিল । এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী এবং স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দলনের প্রেরণা জোগায়।

দ্বিতীয়ত, ভাষা আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে । এই আন্দোলন দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে বাঙালিরা শুরু করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন।ফলে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, মুসলিম লীগ ভাষা আন্দোলনে জনগণের মানসিকতা ও স্বার্থকে উপেক্ষা করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । ফলস্বরূপ, দলটি 1954 সালের নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে হেরে যায়। এরপর আর কোনো নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হয় নি।

চতুর্থত, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারিকে শোকের দিন হিসেবে ছুটি এবং শহীদ দিবস ঘোষণা করা হয়। বাংলা ভাষা 1956 সালে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়।এটি 1962 সালের সংবিধানে বহাল ছিল।

পঞ্চমত, যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য এবং ভাষার বৈষম্য তুলে ধরে । যা পরিস্ফুটিত হয় ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের ৬ দফায়। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন অবশেষে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় যার প্রেরনা ছিল ভাষা আন্দোলন ।

ষষ্ঠত, 1999 সালে ইউনেস্কো কর্তৃক 21শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।এই স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে ।

**১৯৫৩ সাল**

**প্রশ্ন** : ভাষা আন্দলনের পরের বছর (১৯৫৩) শহীদের স্মরণার্থে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়?

**উত্তর** : ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ সালে হাজারো মানুষ ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটের পাশে অস্থায়ীভাবে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সরকার সেদিন সব সভা সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ করেছিল। এই দিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শোকের প্রতীক হিসাবে কালো ব্যাজ ধারণ করেন এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেদিন ঢাকার অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়।

**প্রশ্ন** : শহীদ মিনার কোথায় স্থাপন করা হয়েছে?

**উত্তর** : যেখানে আমাদের ভাষাশহীদরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেখানে এখন আমাদের প্রিয় শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে

**প্রশ্ন** : যুক্তফ্রন্ট কবে এবং কতটি দল নিয়ে গঠিত হয়?

**উত্তর** : মূলত চারটি দল মিলে ১৯৫৩ সালে ৮ ডিসেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

**প্রশ্ন** : যুক্তফ্রন্ট কতটি দল নিয়ে গঠিত হয় এবং কি কি ?

**উত্তর** : মূলত চারটি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যেমন :

·         আওয়ামী মুসলিম লীগ,

·         কৃষক শ্রমিক পার্টি,

·         নেজাম-ই-ইসলাম এবং

·         (পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, পাকিস্তান খিলাফত ইত্যাদি)

**১৯৫৪ সাল**

**প্রশ্ন** : ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে কে সাফল্য অর্জন করে?

**উত্তর** : ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।

**প্রশ্ন** : যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে সাফল্য অর্জন করে?

**উত্তর** : ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট আইন পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৩টি আসন লাভ করে।

১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট আইন পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৩টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হন এবং ১৫মে নতুন প্রাদেশিক সরকারের সমবায় ও কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

**প্রশ্ন** : ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ কতটি আসন লাভ করে?

**উত্তর** : পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে।

**প্রশ্ন** : পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান কোণ আসন থেকে নির্বাচিত হন?

**উত্তর** : পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হন।

**প্রশ্ন** : পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে কি করেন ?

**উত্তর** : ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে, ১৫মে নতুন প্রাদেশিক সরকারের সমবায় ও কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

**প্রশ্ন** : কারা ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণ করে?

উত্তর : ৩রাা এপ্রিল, ১৯৫৪ সালে মওলানা ভাসানী, একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণ করে।

**প্রশ্ন** : কার নির্দেশে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়?

**উত্তর** : ১৯৫৪ সালে ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।

**প্রশ্ন** : ৭ই মে, ১৯৫৪ সালে কোথায় বাংলাকে একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়?

**উত্তর** : ৭ই মে, ১৯৫৪ সালে , পাকিস্তানের পার্লামেন্টে বাংলাকে একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৫৫ সাল

**প্রশ্ন** : বাংলা একাডেমি কি?

**উত্তর** : ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার অন্যতম দাবি ছিল বাংলা ভাষার প্রসার ও গবেষণার জন্য একটি স্বতন্ত্র একাডেমি স্থাপন করা।

বাংলা একাডেমি হল বাংলাদেশের ভাষানিয়ন্ত্রক সংস্থা। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলা একাডেমী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) এই একাডেমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

**১৯৫৬ সাল**

**প্রশ্ন** : স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রবর্তন কবে প্রকাশ পায় ?

**উত্তর** : স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রবর্তন ১৯৫৬ সালে প্রকাশ পায়।

**প্রশ্ন** : স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কি অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

**উত্তর** : স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রবর্তন এবং সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষার হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি কার্যকর হয়।

**প্রশ্ন** : প্রথম শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় কবে?

**উত্তর** : ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ সালে প্রথম শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

**প্রশ্ন** : কোথায় প্রথম শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়?

**উত্তর** : ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটের পাশে বর্তমানে যেখানে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অবস্থিত, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

**১৯৫৭ সাল**

**প্রশ্ন** : ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

**উত্তর** : ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের সন্তোষ কাগমারী এলাকায় ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

**প্রশ্ন** : কার আহ্বানে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?

**উত্তর** : ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের সন্তোষ কাগমারী এলাকায় মওলানা ভাসানীর আহ্বানে আওয়ামী লীগের সার্বিক সহযোগিতায় ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

**প্রশ্ন** : কাগমারী সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী কি ঘোষণা করেন?

**উত্তর** : মাওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন: "যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে, আমি পাকিস্তানকে আসসালামুয়ালাইকুম বলতে বাধ্য হব।"

**১৯৫৮ সাল**

**প্রশ্ন** : কে সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন ?

**উত্তর** : ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খান নুন এর সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন এবং পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন।

**প্রশ্ন** : সামরিক শাসন সূচনা ?

**উত্তর** : একেবারে গোড়া থেকেই পাকিস্তানে শাসনের এক ধরনের ষড়যন্ত্র হতে থাকে, আর সেই ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় ছিল সেনাবাহিনী। দেশের বাজেটের ৬০% ব্যয় করা হতো সেনাবাহিনীর পিছনে, তাই তারা তাদের অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতা, সুবিধার লোভনীয় জীবন বেসামরিক মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। নানারকম টালবাহানা করে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সেনাপতি আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নেন। সেই ক্ষমতায় তিনি একদিন দুইদিন ছিলেন না, ছিলেন টানা এগারো বৎসর। সামরিক শাসন কখনো কোথাও শুভ কিছু আনতে পারে না, সারা পৃথিবীতে একটিও উদাহরণ নেই যেখানে সামরিক শাসন একটি দেশকে এগিয়ে নিতে পেরেছে- আইয়ুব খানও পারেনি।

**উত্তর** : ইস্কান্দর মির্জাকে বিনা রক্তপাতে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন আইয়ুব খান । ক্ষমতায় এসে ১৯৫৮ -১৯৬২ সাল পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

**১৯৬০-১৯৬৩ সাল**

**প্রশ্ন** : কখন শরিফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়?

**উত্তর** : ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে শরিফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

**প্রশ্ন** : শরিফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন শুরু হয় কবে ?

**উত্তর** : ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে শরিফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যা ১৯৬২ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়।

**প্রশ্ন** : ছাত্র সংগঠন কেন শরিফ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন শুরু করে?

**উত্তর** : শরিফ শিক্ষা কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্ট ,যা ১৯৬২ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়। কিন্তু বৈষম্যমূলক বলে ওই শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন শুরু করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৪৪ ধারার মধ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর পূর্বপাকিস্তানে দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। সেদিন ঢাকায় হাইকোর্টের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে নিহত হন ওয়াজিউল্লাহ, গোলাম মোস্তফা এবং বাবুল।

**প্রশ্ন** : কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কবে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়?

**উত্তর** : ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

**প্রশ্ন** : কে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন?

**উত্তর** : ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩সালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ভাষা শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম।

**১৯৬৫ সাল**

**প্রশ্ন** : কীসের ভিত্তিতে আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন?

**উত্তর** : আন্দোলনের মুখে ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নির্বাচন করতে বাধ্য হন। এই নির্বাচনে, আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের (BASIC DEMOCRACY ,BD) ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

**প্রশ্ন** : কতো সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয় ?

**উত্তর** : ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়।

**প্রশ্ন** : ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি কীভাবে স্বাক্ষরিত হয়?

**উত্তর** : ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। 17 দিন স্থায়ী এই যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা অসম সাহসিকতার পরিচয় দেয় । পরে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

**১৯৬৬ সাল**

**প্রশ্ন** : কত তারিখে ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করা হয়?

**উত্তর** : শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

**প্রশ্ন** : ছয় দফা দাবি কেন করা হয় ?

**উত্তর** : শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। প্রস্তাবিত ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এই ছয় দফা মুক্তিকামী বাঙালি জাতির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির বীজ বুনে দেয়, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ায় আঘাত করে।

**প্রশ্ন** : কবে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন?

**উত্তর** : ১ মার্চ ১৯৬৬ সালে , বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

**প্রশ্ন** : শেখ মুজিবুর রহমান কারারুদ্ধ কেন ছিলেন?

**উত্তর** : ১ মার্চ ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ছয় দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে আটবার গ্রেফতার করা হয় এবং সর্বশেষ ৮ মে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। প্রায় তিন বছর শেখ মুজিবুর রহমান কারারুদ্ধ ছিলেন।

**প্রশ্ন** : শেখ মুজিবুর রহমান কবে এবং কোথায় ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন?

**উত্তর** : ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে দলীয় সম্মেলনে বিরোধীদের কাছে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। কিন্তু সেটি তখন গৃহীত হয়নি।

**প্রশ্ন** : ছয় দফা দাবি কী নামে পরিচিত?

**উত্তর** : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে দলীয় সম্মেলনে বিরোধীদের কাছে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন ।যা বাঙালি মুক্তি সনদ বা বাংলা ম্যাগনাকার্টা নামে পরিচিত।

**প্রশ্ন** : ৬ দফা দাবি কিসের প্রস্তাব তুলে ধরে?

**উত্তর** : ৬ দফা দাবি পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে ।

**প্রশ্ন** : পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকা ৬ দফা দাবি সম্পর্কে উল্লেখ করেছিল?

**উত্তর** : ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ সালে ,পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকা ৬ দফা দাবি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলে যে - পাকিস্তানের দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন করার জন্যই ছয় দফা দাবি আনা হয়েছে।

**প্রশ্ন** : ঢাকায় কবে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের সামনে ছয় দফা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন?

**উত্তর** : ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ সালে ,ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের সামনে ছয় দফা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন।

**প্রশ্ন** : ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি গূলো কী কী ?

**উত্তর** : ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি

·         ১ম দফাঃ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি।

·         ২য় দফাঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।

·         ৩য় দফাঃ মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা।

·         ৪র্থ দফাঃ কর বা রাজস্ব বিষয়ক ক্ষমতা।

·         ৫ম দফাঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা।

·         ৬ষ্ঠ দফাঃ আঞ্চলিক মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ক্ষমতা।

**প্রশ্ন** : ১৯৬৬ সাল বাংলাদেশের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

**উত্তর** : আন্দোলনের মূল এজেন্ডা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের কথিত শোষণের অবসান ঘটাতে ১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলির একটি জোটের দ্বারা পেশ করা ছয়টি দাবি উপলব্ধি করা। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

**প্রশ্ন** : বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি ব্যাখ্যা কর ৷

**উত্তর** : ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে আইয়ুব সরকারের বিরোধীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কাঠামো ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এটাই ঐতিহাসিক ‘৬ দফা কর্মসূচি’।

এ ৬ দফাই পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এতে বাঙালির আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বাঁচার মুক্তিসনদরূপে আখ্যায়িত হয়। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এটা ছিল মারণাস্ত্রস্বরূপ।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি : নিম্নে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচির বিবরণ দেওয়া হলো :

১. প্রথম দফা- শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়তে হবে। তাতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে, সকল নির্বাচন সর্বজনীন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভার সার্বভৌমত্ব থাকবে।

বিশ্লেষণ : লাহোর প্রস্তাব ছিল ব্রিটিশ ভারতে পাকিস্তানের মুসলমানদের প্রাণের দাবি। মূলত লাহোর প্রস্তাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিধান উল্লেখ ছিল তার ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের মুসলমানগণ রায় দিয়েছিল।

আবার ১৯৫৪ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মূলে ছিল এই লাহোর প্রস্তাব। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার প্রথম দফায় যে প্রস্তাব করেছেন তা নতুন কোনো প্রস্তাব ছিল না, যা পাক-বাহিনীর মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. দ্বিতীয় দফা- কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা : ফেডারেল সরকারের হাতে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয়ের ক্ষমতা থাকবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশসমূহের হাতে থাকবে।

বিশ্লেষণ : এই দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা আর পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ক্ষমতা দিয়ে এক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

এ দফা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছেন,

“এ প্রস্তাবের জন্যই কায়েমি স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটেছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতে ধ্বংস করার প্রস্তাব দিয়েছি।”

৩. তৃতীয় দফা-মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা : এ দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব ছিল এবং এদের মধ্যে যেকোনো একটি গ্রহণের দাবি করা হয়।

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে।

(খ) দু’অঞ্চলের বা সারা দেশের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন এক সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হতে পারে। এ বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দু অঞ্চলের জন্য দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

বিশ্লেষণ : তৃতীয় দফার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরিউক্ত দুটি বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকবে। যে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমন থাকবে।

৪. চতুর্থ দফা- রাজস্ব কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা : সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে এবং আদায়যোগ্য অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে।

বিশ্লেষণ : ৬ দফার প্রণেতাগণ মনে করেন যে, এ দফার সুবিধা অনেক। যেমন-

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারকে কর আদায়ের কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না।

(খ) কর ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনো দফতর বা কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে না।

(গ) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য কর ধার্য ও আদায়ের মধ্যে কোনোরূপ দ্বৈততা থাকবে না। এতে অপচয় ও অপব্যয় রোধ হবে ।

(ঘ) এর ফলে ধার্য ও আদায়ের একত্রীকরণ সহজ হবে।

৫. পঞ্চম দফা-বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা : এ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নলিখিত শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয় :

(ক) দু’অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে ।

(গ) ফেডারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুটি অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্র নির্ধারিত হারে আদায় হবে।

(ঘ) দেশীয় দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি করা চলবে।

(ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক, বিদেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন এবং আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

বিশ্লেষণ : পঞ্চম দফার যৌক্তিকতা সম্পর্কে ৬ দফার প্রবক্তাগণ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। সেই সাথে পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারে ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নেই, এ অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হচ্ছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অনুন্নতই থেকে যায় ।

৬. ষষ্ঠ দফা-আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা : অঙ্গরাজ্যগুলোর আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি (আধা সামরিক) বাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে ।

বিশ্লেষণ : ষষ্ঠ দফার যৌক্তিকতা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেন এ দাবি অন্যায়ও নয় নতুনও নয়। কারণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবির মধ্যে আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করা হয়েছিল।

 সুতরাং উপরিউক্ত কর্মসূচিগুলো ছিল ৬ দফার অন্তর্ভুক্ত যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন** : ১৯৬৬ সালের ৬ দফার কত’টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল?

**উত্তর** : ১৯৬৬ সালের ৬ দফার ৩টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল

**প্রশ্ন** : কে, কোধায় প্রথম ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন?

**উত্তর** : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে প্রথম ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন।

**প্রশ্ন** : ‘আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি' শীর্ষক পুস্তিকাটি যে নামে প্রচার করা হয়-

**উত্তর** : ‘আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি' শীর্ষক পুস্তিকাটি শেখ মুজিবুর রহমান নামে প্রচার করা হয়।

**প্রশ্ন** : ছয় দফা কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?

**উত্তর** : ছয় দফা ২৩ মার্চ ১৯৬৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?

**প্রশ্ন** : ঐতিহাসিক 'ছয় দফায়' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না-

**উত্তর** : ঐতিহাসিক 'ছয় দফায়' বিচার-ব্যবস্থা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

**১৯৬৮ সাল**

**প্রশ্ন** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত মামলাটি দায়ের করা কত সালে?

**উত্তর** : ৩রা জানুয়ারি, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত মামলাটি দায়ের করা হয়। এ মামলার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার। মামলায় ৩৫জনকে আসামি করা হয়।

**প্রশ্ন** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আনুষ্ঠানিক নাম কী ছিল?

**উত্তর** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার।

**প্রশ্ন** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অথবা রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার, মামলায় কত জনকে আসামি করা হয়?

**উত্তর** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অথবা রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার, মামলায় ৩৫জনকে আসামি করা হয়।

**প্রশ্ন** :  আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ঘটনা ।

**উত্তর** : দেশে সামরিক শাসন, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর এতরকম বঞ্চনা, কাজেই বাঙালিরা সেটি খুব সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বাঙালিদের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্যে স্বায়ত্বশাসন দাবি করে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করলেন। ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সবকরম অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক অসাধারণ দলিল। তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর যেরকম অত্যাচার নির্যাতন চলছিল, তার মাঝে ছয় দফা দিয়ে স্বায়ত্বশাসনের মতো একটি দাবি তোলায় খুব সাহসের প্রয়োজন। ছয় দফার দাবি করার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগের ছোট বড় সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয়া হলো। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে একটি কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্যে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে দেশদ্রোহিতার একটি মামলার প্রধান আসামি করে দেয়া হলো।

৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।

**প্রশ্ন** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় কী কী কার্যক্রম কোড়া হয়েছিলো ?

**উত্তর** : ৬ই জানুয়ারি, ১৯৬৮ সালে , ২ জন সিএসপি অফিসারসহ মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।রাষ্ট্রদ্রোহিতার এই মামলার বিচার প্রক্রিয়ায়, প্রথমে আসামিদেরকে ‘দেশরক্ষা আইন' থেকে মুক্তি দেয়া হয়। পরবর্তীতে 'আর্মি, নেভি অ্যান্ড এয়ারফোর্স অ্যাক্টে’ কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বিচার শুরু হয়।

**প্রশ্ন** : কত তারিখে বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়?

**উত্তর** : ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। তখন বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ শুরু হয়।

**প্রশ্ন** : কবে ও কোথায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের বিচারকার্য শুরু হয়?

**উত্তর** : ১৯ জুন ১৯৬৮ সালে ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের বিচারকার্য শুরু হয়।

**প্রশ্ন** : আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কি ছিল ?

**উত্তর** : আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য -

1. পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নির্মূল।

2. পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এই অনুভূতি জাগানো যে বাঙালিরা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

3. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া।

**প্রশ্ন** : আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি কারা ছিলেন ?

**উত্তর** : আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি হলেন-

১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি মামলার আসামিদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো

1. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)

2. লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল)

3. সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)

4. ক্যাপ্টেন শওকত আলী (ফরিদপুর)

5. ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান (নরসিংদী)

**১৯৬৯ সাল**

**প্রশ্ন** : কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কেন?

**উত্তর** : ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

**প্রশ্ন** : কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কবে?

**উত্তর** : ৫ জানুয়ারী ১৯৬৯ সালে,৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

**প্রশ্ন** : আইয়ুব সরকার ষড়যন্ত্র মামলার সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় কেন?

**উত্তর** : ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে ,আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র গণআন্দোলন শুরু হয়। টানা গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

**প্রশ্ন** : কখন পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে?

**উত্তর** : ১৯৬৯ সালের শুরুতে পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কিছুতেই এটা মেনে নিল না এবং সারাদেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। জেল-জুলুম, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)-এর গুলি, কিছুই বাকি থাকল না, কিন্তু সেই আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা গেল না। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল ছাত্ররা, তাদের ছিল এগারো দফা দাবি। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন জেলের বাইরে, তিনিও এগিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে সেই আন্দোলন একটি গণবিস্ফোরণে রূপ নিল কার সাধ্যি তাকে থামায়? ৬৯-এর গণআন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল ফুটফুটে কিশোর মতিউর, প্রাণ দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ।

**প্রশ্ন** : আইয়ুব খান কবে ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন?

**উত্তর** : ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

**প্রশ্ন** : ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন ?

**উত্তর** : ২০শে জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে পুলিশের গুলিতে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ মৃত্যুবরণ করেন।

**প্রশ্ন** : আসাদগেট নামকরণ কীভাবে করা হয় ?

**উত্তর** : ১৯৬৯ সালে পুলিশের গুলিতে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ মৃত্যুবরণ করেন।

সহযোদ্ধারা আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে মিছিল করে। পরে শেরে বাংলা নগর ও মোহাম্মদপুরের সংযোগ স্থলে আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তন করে আসাদগেট নামকরণ করা হয়।

**প্রশ্ন** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নম্বর আসামি কে ছিলেন?

**উত্তর** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নম্বর আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক।

**প্রশ্ন** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নম্বর আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক কীভাবে মারা যান?

**উত্তর** : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নম্বর আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ১৫ই ফেব্রুয়ারি বন্দি থাকা অবস্থায় ঢাকার কুর্মিটোলা সেনানিবাসে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তানী একজন সৈনিকের ছোড়া রাইফেলের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন। ওই দিন রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

**প্রশ্ন** : কবে এবং কোথায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

**উত্তর** : '৬৯ এর গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একক এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি' ৬৯ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল গণ-সম্বর্ধনায় শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

**প্রশ্ন** : রেসকোর্স ময়দান এর বর্তমান নাম কী

**উত্তর** : রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত ।

**প্রশ্ন** : কে পূর্ব বাংলার নাম রাখেন ‘বাংলাদেশ’?

**উত্তর** : বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নাম রাখেন ‘বাংলাদেশ’।

**প্রশ্ন** : কোথায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নাম রাখেন ‘বাংলাদেশ’?

**উত্তর** : ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে , সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আওয়ামী লীগের এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নাম রাখেন ‘বাংলাদেশ’।

**প্রশ্ন** : '৬৯ এর গণ-আন্দোলনের শ্লোগান কি ছিল ?

**উত্তর** : পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শ্লোগান পরিবর্তিত হয়। 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা।' পিন্ডি না ঢাকা- ঢাকা ঢাকা। 'জাগো জাগো-বাঙালি জাগো'।

**প্রশ্ন** : কখন রাজনৈতিক দলের ৬ দফা দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়?

**উত্তর** : পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শ্লোগান পরিবর্তিত হয়। 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা।' পিন্ডি না ঢাকা- ঢাকা ঢাকা। 'জাগো জাগো-বাঙালি জাগো'। এই ধারাবাহিকতায় স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে উন্মক্ত করে। অহিংস আন্দোলন সহিংসতার দিকে ধাবিত হতে থাকে। এই সময় রাজনৈতিক দলের ৬ দফা দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়।

**প্রশ্ন** : ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকায় শহীদের দুটি উল্লেখযোগ্য নাম লিখো।

**উত্তর** :  '৬৯ এর গণ-আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ২০শে জানুয়ারী' ৬৯ ছাত্র আসাদুজ্জামান এবং ২৪শে জানুয়ারী'৬৯ স্কুল ছাত্র মতিউর রহমান মৃত্যুবরণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকায় শহীদ আসাদ-মতিউর দুটি উল্লেখযোগ্য নাম।

**প্রশ্ন** : বঙ্গভবনের সামনের উদ্যানের নাম 'মতিউর রহমান শিশু উদ্যান' করা হয় কেন?

**উত্তর** : '৬৯ এর গণ-আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ২৪শে জানুয়ারী'৬৯ স্কুল ছাত্র মতিউর রহমান মৃত্যুবরণ করে। বঙ্গভবনের সামনের উদ্যানের নাম 'মতিউর রহমান শিশু উদ্যান' করা হয় ।

**প্রশ্ন** : কত তারিখে আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন?

**উত্তর** : ১৫ই ফেব্রুয়ারি' ৬৯ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত অবস্থায় বন্দী আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন।

**প্রশ্ন** : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন কত তারিখে ?

**উত্তর** : ১৮ই ফেব্রুয়ারি' ৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

**প্রশ্ন** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সার্জেন্ট জহুরুল হক হল' ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শামসুজ্জোহা হল' নামকরনের কারন কি ?

**উত্তর** : মামলায় অভিযুক্ত ও বন্দী অবস্থায় সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ডঃ শামসুজ্জোহাকে জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। উভয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক হিসাবে চিহ্নিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সার্জেন্ট জহুরুল হক হল' ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শামসুজ্জোহা হল' তাদের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।

**প্রশ্ন** : '৬৯ এর এই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের নাম ।

**উত্তর** : '৬৯ এর এই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ, আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমেদ, আসম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, সামসুদ্দোহা, মোস্তফা জামাল হায়দর, রাশেদ খান মেনন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, দীপা দত্ত, হায়দর আকবর খান রণোসহ অনেকে।

**প্রশ্ন** : কাদের নিরলস পরিশ্রম ও নির্দেশনায় '৬৯ এর এই ছাত্র আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করেছিল?

**উত্তর** : রাজনৈতিক দলীয় প্রধান যাদের নিরলস পরিশ্রম ও নির্দেশনায় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের এই আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করেছিল তাদের মধ্যে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কমরেড মনি সিং, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, শ্রীমনোরঞ্জন ধর অন্যতম।

**প্রশ্ন** : গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব লিখো ।

**উত্তর** : গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলের সবচেয়ে শক্তিশালী আন্দোলন। 1948 সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের তার সাফল্য জনক পরিনতি আইয়ুব খান এর পতন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি হয়।

স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালির যে জাতীয়তাবোধ 1948 সালে সৃষ্টি হয়েছিল ,এর পূর্ণতা পায় 1969 সালের জনপ্রিয় গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। 1969 সালের জনপ্রিয় গণ অভ্যুত্থান .২১শে ফেব্রুয়ারীকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যা একটি জাতীয় প্রতীক। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনামলে এই ছুটি বাতিল করা হয় আওয়ামী লীগের 1970 সালের বিজয়ের পেছনে ছিল 1969 সালের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ।

**১৯৭০ সাল**

**প্রশ্ন** : ১৯৭০ সালের কত তারিখে বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন?

**উত্তর** : ৬ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন।

**প্রশ্ন** : ১৯৭০ সালের কত তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার আলোকে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বা‌ন জানান?

**উত্তর** : ৭ জুন ১৯৭০ সালে ,রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার আলোকে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বা‌ন জানান। আওয়ামী লীগের জন্য তিনি নৌকা প্রতীক বেছে নেন।

**প্রশ্ন** : ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের কারন কি ছিল?

**উত্তর** : ইতিহাসের অন্যতম প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় উপকূল এলাকায় লাখো মানুষের প্রাণহানি ঘটে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভোলার সাইক্লোনকে মোটেও গুরুত্ব দেননি, আর বিষয়টি এ অঞ্চলের মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছিল। ১২ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা স্থগিত রেখে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছুটে যান। যা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় ত্বরান্বিত করেছিল।

**প্রশ্ন** : পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কখন ?

**উত্তর** : ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে,তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

**প্রশ্ন** : আওয়ামী লীগ কীভাবে ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে?

**উত্তর** : ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশে ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসনে (সংরক্ষিত ১০ টি নারী আসনসহ) আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৩১০ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ম্যান্ডেট লাভ করে।

**প্রশ্ন** : ৭০ এর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয়?

**উত্তর** : ৭ই ডিসেম্বর '৭০ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর' ৭০ এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয়

**প্রশ্ন** : মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান কেন সারা দেশে এক ব্যক্তি এক ভোটের নীতিতে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন

**উত্তর** : ২৫শে মার্চ ৬৯ সারা দেশে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও সামরিক সরকার গণ-দাবিকে উপেক্ষা করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সারা দেশে এক ব্যক্তি এক ভোটের নীতিতে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন।

**১৯৭১ সালে**

**প্রশ্ন** : কত তারিখে ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন?

**উত্তর** : ১ মার্চ ১৯৭১ সালে এক হটকারী সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলার আপামর জনতা।

**প্রশ্ন** : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা কখন এবং কোথায় উত্তোলন করা হয়?

**উত্তর** : ২রা মার্চ ১৯৭১সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে আয়োজিত ছাত্র-জনতার বিশাল এক সমাবেশে উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা।

**প্রশ্ন** : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা কারা উত্তোলন করেন ?

**উত্তর** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে আয়োজিত ছাত্র-জনতার বিশাল এক সমাবেশে তৎকালীন ডাকসু ভিপি আসম আব্দুর রব ও ডাকসু নেতারা উত্তোলন করেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা।

**প্রশ্ন** :  জাতীয় সংসদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের কেন বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ ১৯৭১ দেশব্যাপী অসহযোগের আহবান জানান?

**উত্তর** : ১৯৭০ সালে নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে মত দিতে অস্বীকার করেন। একটি রাজনৈতিক দল জনগণের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেয়েছে। তারা সরকার গঠন করবে, এটাই ছিল বাস্তবতা। কিন্তু সামরিক শাসকগণ সরকার গঠন বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এক আলোচনা শুরু করে। কিসের জন্য আলোচনা, এটা বুঝতে বাঙালি নেতৃবৃন্দের খুব একটা সময় লাগেনি। জাতীয় সংসদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ ১৯৭১ দেশব্যাপী অসহযোগের আহবান জানান। সর্বস্তরের জনগণ একবাক্যে বঙ্গবন্ধুর এই আহবানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে।

**প্রশ্ন** : ইয়াহিয়া ঢাকায় পার্লামেন্টারি পার্টিগুলোর নেতাদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন কত তারিখে?

**উত্তর** : ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় পার্লামেন্টারি পার্টিগুলোর নেতাদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন।

**প্রশ্ন** : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার কোথায় এবং কখন পাঠ করা হয়?

**উত্তর** : ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া ঢাকায় পার্লামেন্টারি পার্টিগুলোর নেতাদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ৩ মার্চ বিকেলে ছাত্রলীগ সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল ছাত্র জন সভায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ বঙ্গবন্ধুর সামনে পাঠ করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার।

**প্রশ্ন** : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহারে কি ছিল?

**উত্তর** : ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইসতেহারে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

**প্রশ্ন** : ৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনী ভাষণের কারন কি ছিল?

**উত্তর** : পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পরিচালিত সরকার জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কোন সমাধান না দেওয়ায়, ৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক দিকনির্দেশনী ভাষণে সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্ত্তত হতে আহবান জানান।

৭ই মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ কোন দলীয় নেতার নির্দেশ ছিল না। ছিল একজন জাতীয় নেতার নির্দেশ। এই নির্দেশ দেশের সর্বস্তরের ছাত্র, জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাঙালি সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকেই সচেতন করে তোলে।

**প্রশ্ন** : ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সময়কাল কত ছিল?

**উত্তর** : তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় ১৮ মিনিট ব্যাপী ভাষণ দেন। ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও, সেখানেই শেখ মুজিব বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

**প্রশ্ন** : ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

**উত্তর** : আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম, নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলব, এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর–নারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব; এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন, তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্দুকের মুখে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।

কী পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলি করা হয়েছে, কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকব।

আমি বলেছি, কিসের বৈঠক বসবে, কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার, ২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছে। আমার দাবি মানতে হবে: প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল উইথ ড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে । তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেণ্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না।

২৮ তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাঁদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে চালাবেন। কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে–শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের ভাষণগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হিসাবে বিবেচিত।

**প্রশ্ন** : কত তারিখে পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়।

**উত্তর** : ২৩শে মার্চ ৭১ সকালে পল্টন ময়দানে জয় বাংলা বাহিনীর এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ মিছিল সহকারে বাংলাদেশের পতাকাসহ বঙ্গবন্ধু ভবনে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়িতে এই পতাকা উত্তোলন করেন। একই সাথে বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে এই পতাকা লাগান হয়। ২৩শে মার্চ পূর্ব বাংলার প্রতিটি শহরে পাকিস্তান দিবসের অনুষ্ঠান বর্জিত হয় এবং পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়।

**কালো রাত (২৫শে মার্চ )**

**প্রশ্ন** : ‘অপারেশন সার্চলাইট কি?

**উত্তর** : পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যার শুরু হয়েছিল ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে। ওই রাতে হামলার সামরিক নাম ছিল অপারেশন সার্চলাইট। সেই রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে।

অন্যদিকে ক্ষমতার হস্তান্তরের নামে এই আলোচনা চলা অবস্থায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সৃষ্ট সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে নতুন করে সংকটের সৃষ্টি করে। অযৌক্তিক দাবি উপস্থাপনের ফলে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের পথ এক সময় রুদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তান সামরিক শাসকগণ স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রস্ত্ততি গ্রহণ করে। একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের জন্য রাজনৈতিক আলোচনার আড়ালে সামরিক বাহিনী মাত্র ২২ দিনে দুই ডিভিশন অবাঙালি সৈন্য পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরে সক্ষম হয়। বাস্তবতায় এটিই ছিল তাদের আলোচনার নামে কালক্ষেপণের মূল উদ্দেশ্য। ২৪শে মার্চ ৭১ সামরিক শাসকগণ হেলিকপ্টার যোগে সমস্ত সেনানিবাসে এই আক্রমণের পরিকল্পনা হস্তান্তর করে। বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এই কুখ্যাত হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ নামা ''অপারেশন সার্চ লাইট'' নামে পরিচিতি।

**প্রশ্ন** : কালো রাত বলা হয় কোণ রাত কে?

**উত্তর** : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতকে কালরাত ও বলা হয় ।

**প্রশ্ন** : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত কেন কালরাত ও বলা হয় ?

**উত্তর** : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য অপারেশন সার্চলাইট নামে একটি সামরিক অভিযানের মাধ্যমে দেশের প্রধান শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়।।

‘অপারেশন সার্চলাইটের’ নামে পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত নৃশংস সেই হামলায় মৃত্যুপুরী হয়ে ওঠে সমগ্র ঢাকা শহর। রাত দশটার দিকে শুরু হয় সেই পরিকল্পিত বর্বর গণহত্যা। পিলখানা, ইপিআর হেডকোয়ার্টার্স, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটে চালানো হয় নির্মম হত্যাযজ্ঞ।

**প্রশ্ন** : ধানমন্ডি বাসভবন থেকে বন্দী হবার পূর্বে তিনি দলীয় নেতৃবন্দেকে কি বলেছিলেন ?

**উত্তর** : ২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার ৭১ রাত্র ১১টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত আক্রমণের প্রস্ত্ততি নিয়ে সেনানিবাস অথবা আক্রমণ প্রস্ত্ততিস্থানগুলি ত্যাগ করে। একই সাথে ঢাকাসহ দেশের সমস্ত বড় শহর ও সেনানিবাসের বাঙালি রেজিমেন্টসমূহ আক্রান্ত হয়। সেনাবাহিনীর হাতে বঙ্গবন্ধু রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ধানমন্ডি বাসভবন থেকে বন্দী হবার পূর্বে তিনি দলীয় নেতৃবন্দেকে করণীয় বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে অবস্থান পরিবর্তনের কথা বলেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

**প্রশ্ন** : ২৫শে মার্চ রাতে কি ঘটেছিল ?

**উত্তর** : ‘অপারেশন সার্চলাইটের’ নামে পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত নৃশংস সেই হামলায় মৃত্যুপুরী হয়ে ওঠে সমগ্র ঢাকা শহর। রাত দশটার দিকে শুরু হয় সেই পরিকল্পিত বর্বর গণহত্যা। পিলখানা, ইপিআর হেডকোয়ার্টার্স, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটে চালানো হয় নির্মম হত্যাযজ্ঞ।

২৫শে মার্চ রাতে, ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে বাংলার ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) তাদের প্রথম আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল। এই রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হন এবং আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার স্বপক্ষের সংগঠনের নেতারা আত্মগোপন করেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বড় শহরগুলোতে গণহত্যা শুরু করে। তাদের পূর্বপরিকল্পিত এই গণহত্যাটি ''অপারেশন সার্চলাইট'' নামে পরিচিত। এ গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগে থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসারদের হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়। ঢাকার পিলখানায়, ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ই বি আর সিসহ সারাদেশের সামরিক আধাসামরিক সৈন্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ডের কথা যেন বহির্বিশব না জানতে পারে সে জন্য আগেই সকল বিদেশি সাংবাদিকদের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং অনেককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। তবে ওয়াশিংটন পোস্টের বিখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব এই গণহত্যা সম্পর্কে অবগত হয়। আলোচনার নামে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কালক্ষেপণও এই গণহত্যা পরিকল্পনারই অংশ ছিল।

**প্রশ্ন** : কোথায় এবং কে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন?

**উত্তর** : ২৫শে মার্চ রাতে সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে যায়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে (১২:২০ মিনিটে) পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আটকের আগেই শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে একটি তারবার্তা পাঠান। আওয়ামী লীগ নেতারা চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র বা চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দখল করে। সেখান থেকে ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান। স্থানীয় আওয়ামী লীগের অনুরোধে ২৭ মার্চ সকালে মেজর জিয়াউর রহমান একই রেডিও স্টেশন থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সম্প্রচার করেন (On Behalf of Our Great Leader..... ) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৭ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ একটি বাস্তব রুপ লাভ করে।

**প্রশ্ন** : বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে কি উল্লেখ ছিল?

**উত্তর** : স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে মেজর জিয়াউর রহমান উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নবগঠিত এই রাষ্ট্রের সরকার জোটবদ্ধ না হয়ে বিশেবর অপর রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে আগ্রহী। এছাড়াও এ ঘোষণায় সারা বিশেবর সরকারগুলোকে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়।

**প্রশ্ন** : শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা কোথায় উল্লেখ করা হয়?

**উত্তর** : ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ৩য় খণ্ডে শেখ মুজিবের এই ঘোষণা উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, ২৫শে মার্চে মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে এ ঘোষণা দেন তিনি। যা তৎকালীন ইপিআর- এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন।

**প্রশ্ন** : কত তারিখে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?

**উত্তর** : ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। নির্বাচিত সাংসদগণ আগরতলায় একত্রিত হয়ে এক সর্বসস্মত সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করেন। এই সরকার স্বাধীন সার্বভৌম ''গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার''। স্বাধীনতার সনদ (Charter of Independence) বলে এই সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়।

**প্রশ্ন** : আনুষ্ঠানিক ভাবে কখন ও কোথায় স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র জারি করা হয় ?

**উত্তর** : ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সাল থেকেই “আকাশ বানী” থেকে বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র জারি করা হয়।

**প্রশ্ন** : কোথায় অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে?

**উত্তর** : ১৭ই এপ্রিল ৭১ মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামে বৈদ্যনাথ তলায় ''গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'' / ‘অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার’ আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন।

**প্রশ্ন** : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন।

**উত্তর** : ১৭ই এপ্রিল ৭১ মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামে বৈদ্যনাথ তলায় ''গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'' আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির এই সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের শপথ পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পীকার অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

**প্রশ্ন** :  যেসব নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় তাদের নাম ।

**উত্তর** :  যে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় তাঁরা হলেনঃ

১।   রাষ্ট্রপতি     :        বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানে বন্দী)

২।   উপ-রাষ্ট্রপতি :        সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)

৩।   প্রধানমন্ত্রী       :    আহমেদ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

৪।   অর্থমন্ত্রী            : ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

৫।   পররাষ্ট্রমন্ত্রী       :  খন্দকার মোশতাক আহমেদ (আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

৬।   স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী          :এ এইচ এম কামরুজ্জামান (ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

**প্রশ্ন** : “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার” বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে কারা দায়িত্ব পালন করবেন বলে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়?

**উত্তর** :  উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে) এবং কর্নেল এম এ জি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশ বিদেশের শতাধিক সাংবাদিক ও হাজার হাজার দেশবাসীর উপস্থিতিতে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংসদ জনাব আবদুল মান্নান। নবগঠিত সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই স্থানটির নামকরণ করা হয় ''মুজিব নগর''।

**প্রশ্ন** : দোসররা খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর এলাকা।

**উত্তর** : ২০ মে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসররা খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর এলাকায় অতর্কিতে হামলা চালিয়ে মুক্তিকামী ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। একদিনে, একটিমাত্র জায়গায় এবং ঠাণ্ডা মাথায় যে বিপুলসংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়, তার নজির ইতিহাসে খুব বেশি নেই।

**প্রশ্ন** : মুক্তিযুদ্ধকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বসম্মতিক্রমে একটি ''সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ'' গঠন করেন। এর সদস্যদের নামঃ

**উত্তর** : মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিকভাবে এই যুদ্ধকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বসম্মতিক্রমে একটি ''সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ'' গঠন করেন। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেনঃ

ক) জনাব আব্দুল হামিদ খান ভাসানী  (সভাপতি)--ন্যাপ ভাসানী

খ) শ্রী মনি সিং                 (সভাপতি)--বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি

গ) অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ      (সভাপতি)--ন্যাপ মোজাফ্ফর

ঘ) শ্রী মনোরঞ্জন ধর               (সভাপতি)--বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস

ঙ) জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ          (প্রধানমন্ত্রী)--পদাধিকারবলে

চ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ         (পররাষ্ট্রমন্ত্রী)--পদাধিকারবলে

**প্রশ্ন** : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কত মাসব্যাপী োমুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন?

**উত্তর** : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র এই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন।

**প্রশ্ন** : বাংলাদেশকে সর্বমোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় কবে?

**উত্তর** : ১০-১৭ জুলাই ১৯৭১ সালে সেক্টর কমান্ডারদের এক সম্মেলনে বাংলাদেশের সামরিক কমান্ড তৈরি করা হয়। কর্নেল (অবঃ) মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়। বাংলাদেশকে সর্বমোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রতিটি সেক্টরের জন্য একজন করে অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়।

**প্রশ্ন** : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গুরুত্ব ।

**উত্তর** : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং অবরুদ্ধ এলাকার জনগণের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নীতি নির্ধারণী ভাষণসহ জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশাবলী প্রচারিত হয়। প্রতিদিনের সংবাদসহ যে সমস্ত অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার মধ্যে চরমপত্র ও জল্লাদের দরবার অন্যতম। যে সমস্ত ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাঁরা হলেনঃ

সর্বজনাব এম এ মান্নান এম এন এ, জিল্লুর রহমান এম এন এ, শওকত ওসমান, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ আনিসুজ্জামান, সিকান্দার আবু জাফর, কল্যাণ মিত্র, ফয়েজ আহমদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, তোয়াব খান, আসাদ চৌধুরী, কামাল লোহানী, আলমগীর কবীর, মহাদেব সাহা, আলী যাকের, সৈয়দ হাসান ইমাম, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল জববার, আপেল মাহমুদ, রর্থীন্দ্রনাথ রায়, কাদেরী কিবরিয়া, ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, সমর দাস, অজিত রায়, রাজু আহামেদ, মামুনুর রশীদ, বেগম মুশতারী শফি, শাহীন মাহমুদ, কল্যাণী ঘোষ, ডালিয়া নওশীন, মিতালী মুখার্জী, বুলবুল মহলানবীশ, শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান খান, সৈয়দ আবদুস সাকেরসহ অনেকে।

**প্রশ্ন** : মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে কতটি যুদ্ধঅঞ্চলে বিভক্ত করা হয়?

**উত্তর** : মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল '৭১ বাংলাদেশ সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি যুদ্ধঅঞ্চলে বিভক্ত করেন। এই ৪টি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেনঃ

ক)     চট্টগ্রাম অঞ্চল - মেজর জিয়াউর রহমান

খ)      কুমিল্লা অঞ্চল - মেজর খালেদ মোশাররফ

গ)      সিলেট অঞ্চল - মেজর কে এম সফিউল্লাহ

ঘ)      দক্ষিণ পশ্চিম - অঞ্চল মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

পরবর্তীতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে বিভক্ত করে রাজশাহী অঞ্চলে মেজর নাজমুল হক, দিনাজপুর অঞ্চলে মেজর নওয়াজেস উদ্দিন এবং খুলনা অঞ্চলে মেজর জলিলকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

**প্রশ্ন** : জেড, এস,কে ফোর্স' কেন গঠন করা হয়?

**উত্তর** : ৭ই জুলাই ৭১ যুদ্ধের কৌশলগত কারণে সরকার নিয়মিত পদাতিক ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনায় 'জেড ফোর্স' ব্রিগেড গঠন করেন। এই জেড ফোর্সের অধিনায়ক হলেন লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান। একই ভাবে সেপ্টেম্বর মাসে 'এস ফোর্স' এবং ১৪ই অক্টোবর 'কে ফোর্স' গঠন করা হয়।

তিনজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তার অধীনে তিনটি বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়।

·         জেড ফোর্স (জিয়াউর রহমান)

·         এস ফোর্স (কে.এম. শফিউল্লাহ)

·         কে ফোর্স (খালেদ মোশাররফ)

**প্রশ্ন** : ১১ টি সেক্টর এর সেক্টর কমান্ডের কারা ছিলেন এবং কোণ এলাকা ছিল ?

**উত্তর** : সেক্টর-এক---- মেজর রফিকুল ইসলাম    (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার অংশ বিশেষ (মুহুরী নদীর পূর্বপাড় পর্যন্ত)। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২১০০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২০,০০০।

সেক্টর-দুই----মেজর খালেদ মোশাররফ    (কুমিল্লা জেলার অংশ, ঢাকা জেলা ও ফরিদপুর জেলার অংশ এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি)। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৪,০০০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৩০,০০০।

সেক্টর-তিন----মেজর কে এম শফিউল্লাহ   (কুমিল্লা জেলার অংশ, ময়মনসিংহ জেলার অংশ, ঢাকা ও সিলেট জেলার অংশ)।এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৬৬৯৩ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২৫,০০০।

সেক্টর-চার----মেজর সি আর দত্ত          (সিলেট জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি)। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৯৭৫ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৯,০০০।

সেক্টর-পাঁচ----মেজর মীর শওকত আলী       সিলেট জেলার অংশ ও ময়মনসিংহ জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ১৯৩৬ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৯,০০০।

সেক্টর-ছয়---- উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার       রংপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ১১,০০০।

সেক্টর-সাত----মেজর নাজমুল হক     রংপুর জেলার অংশ, রাজশাহী জেলার অংশ, পাবনা জেলার অংশ ও দিনাজপুর জেলার অংশ, বগুড়া জেলা। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল নয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ১২,৫০০। সেপ্টেম্বর মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় মেজর নাজমুল হক নিহত হওয়ার পর লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেক্টর-আট----মেজর আবু ওসমান চৌধুরী     যশোর জেলা, ফরিদপুর জেলা, কুষ্টিয়া জেলা, খুলনা ও বরিশাল জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৩৩১১ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৮,০০০। ১৮ই আগস্ট লেঃ কর্নেল এম আবুল মঞ্জুর সেক্টর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেক্টর-নয়---- মেজর আবদুল জলিল   বরিশাল জেলার অংশ, পটুয়াখালী জেলা, খুলনা, ফরিদপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল তিনটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৩৩১১ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৮,০০০।

সেক্টর-দশ----প্রধান সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে (নৌ সেক্টর)সমগ্র বাংলাদেশ। এই সেক্টরটি গঠিত হয়েছিল নৌ-কমান্ডোদের দিয়ে। বিভিন্ন নদী বন্দর ও শক্র পক্ষের নৌ-যানগুলোতে অভিযান চালানোর জন্য এঁদের বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। লক্ষ্যবস্ত্তর গুরুত্ব এবং পাকিস্তানিদের প্রস্ত্ততি বিশ্লেষণ করে অভিযানে সাফল্য নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হতো এবং তার ওপর নির্ভর করত অভিযানে অংশগ্রহণকারী দলসমূহে যোদ্ধার সংখ্যা কত হবে। যে সেক্টর এলাকায় কমান্ডো অভিযান চালানো হতো, কমান্ডোরা সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করত। নৌ-অভিযান শেষে তারা আবার তাদের মূল সেক্টর- ১০ নম্বর সেক্টরের আওতায় চলে আসত। নৌ-কমান্ডোর সংখ্যা ছিল ৫১৫ জন।

সেক্টর এগার----মেজর আবু তাহের।     ময়মনসিংহ জেলার অংশ, সিলেট জেলার অংশ ও রংপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২৫,০০০। মেজর আবু তাহের ১৪ নভেম্বর আহত হওয়ার পর এই সেক্টরের দায়িত্ব কাউকেও দেয়া হয়নি।

**প্রশ্ন** : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

**উত্তর** : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত একটি বিপ্লব ও সশস্ত্র সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এবং বাঙালি গণহত্যার প্রেক্ষিতে এই জনযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে এবং নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা শুরু করে। এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী সাধারণ বাঙালি নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং পুলিশ ও ইপিআর কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়। সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

**প্রশ্ন** : রাষ্ট্রের নাম হিসেবে “বাংলাদেশ” কার্যকর হয় কখন থেকে?

**উত্তর** : ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চকে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এই দিন থেকেই রাষ্ট্রের নাম হিসেবে “বাংলাদেশ” কার্যকর হয়।

**প্রশ্ন** : মুক্তি যুদ্ধের সূচনা ।

**উত্তর** : মার্চ থেকে জুন

ঢাকায় গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১০ এপ্রিলের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ নিজেদের আয়ত্তে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু বাঙালিরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম দিকে বাঙালিদের প্রতিরোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু অসংগঠিত। এই প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।[১১৪] তবে, পাকিস্তানি বাহিনী সাধারণ নাগরিকদের ওপর আক্রমণ শুরু করলে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যায় এবং প্রতিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠে। ক্রমশ মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বাড়তে থাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের দমনে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি সৈনিক পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে “গুপ্ত সেনাবাহিনী”তে যোগদান করে। সেনাবাহিনী ও ইপিআর সদস্যরা বিদ্রোহ করে চট্টগ্রাম শহরের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। চট্টগ্রাম শহরের নিয়ন্ত্রণ পেতে পাকিস্তানি বাহিনীকে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করতে হয় এবং বিমানে আক্রমণ চালাতে হয়।[১১৫] বিদ্রোহী সেনারা কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলারও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। বাঙালি সেনারা একসময় মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে তাদের অস্ত্র সরবরাহ করে। পাশাপাশি ভারত থেকেও অস্ত্রের চালান আসতে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষ দুই ডিভিশন সেনা পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়। বিপুল সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে সেনাবাহিনী মে মাসের শেষ নাগাদ অধিকাংশ মুক্তাঞ্চলের দখল নিয়ে নেয়। এই সময়ে রাজাকার, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করা হয়। মূলত মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের সদস্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী বাঙালি এবং দেশভাগের সময় আসা বিহারি মুসলিমদের নিয়ে এই দলগুলো গঠিত হয়।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়ায় (বর্তমানে মুজিবনগর) মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, তার অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১১৬] মার্চের শেষদিক থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘুরা বিশেষভাবে তাদের রোষের শিকার হয়। আক্রমণ থেকে বাঁচতে দলে দলে মানুষ ভারতের সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া শরণার্থীদের এই স্রোত নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্যে আশ্রয় নেয়।[১১৭] পাকিস্তানি সেনাদের ওপর মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ অব্যাহত থাকে। কিন্তু অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের অভাবে যুদ্ধ পরিকল্পিত রূপ লাভ করতে করতে জুন মাস পার হয়ে যায়।

**প্রশ্ন** : মুক্তিবাহিনীর নৌ ইউনিট কত সাল সংগঠিত হয়?

**উত্তর** : নৌ-বাহিনী

কর্নেল ওসমানী ভারতীয় বাহিনীর পরামর্শে ১৯৭১ সালের জুন মাসে একটি নৌ ইউনিট গঠন করেন। এটি ছিল একটি কম্যান্ডো ইউনিট। প্রথমে এর দায়িত্বে ছিলেন চীফ পেটি অফিসার রহমতুল্লাহ। পরে এর নেতৃত্বে দেয়া হয় বিমানবাহিনী কর্মকর্তা আহমেদ রেজাকে। বিশেষ গোপনীয়তার সঙ্গে এই মুক্তিবাহিনীর এই নৌ ইউনিট সংগঠিত করা হয়েছিল।

**প্রশ্ন** : বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠনের সূচনা ও মুক্তিযুদ্ধে অপারেশনাল কার্যক্রম ।

**উত্তর** : বিমান বাহিনী

১৯৭১ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিমান বাহিনীর সৈনিকেরা ওতপ্ৰোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং স্থল যুদ্ধের প্ৰস্তুতি ও পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেন১৯৭১ সালের জুলাইয়ে সেক্টর অধিনায়কদের সম্মেলনের সময় বিমান বাহিনী গঠন নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নি। কারণ সেই সময় তা সম্ভবপর এবং যুক্তি সংগত ছিলনা। ফলে আনুষ্ঠানিক কোন সিদ্ধান্তে পৌছায়নি প্ৰবাসী সরকার। কিন্ত যুদ্ধের শুরু থেকেই বেশ কিছু বিমান বাহিনীর কৰ্মকৰ্তা ও সদস্য সক্ৰিয় ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার ও স্কোয়াড্ৰন লিডার এম হামিদুল্লাহ্ খান ছিলেন যথাক্রমে ৬ ও ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক। এছাড়াও জেড ফোৰ্সে আশরাফ, রউফ, লিয়াকত প্ৰমুখও যুদ্ধ ময়দানে বিভিন্ন গুরুত্বপূৰ্ণ পদে দায়িত্বরত ছিলেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের ডিমাপুরে গঠিত হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। শুরুতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জনবল ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পক্ষত্যাগী বাঙালি কর্মকর্তা ও বিমানসেনারা। সে সময় ভারতে আশ্ৰয় নিয়ে যুদ্ধ সমাপ্ত পৰ্যন্ত থেকে যাওয়া বেশ কিছু বিমান কৰ্মকৰ্তা ছিলেন; যেমন বদরুল আলম, এ কে খন্দকার, সুলতান মাহমুদ, পিআইএ পাইলট ক্যাপ্টেন সাহাবুদ্দিন আহমেদ, সাবেক পিআইএ পাইলট ক্যাপ্টেন সাত্তার, সাবেক পিআইএ পাইলট ক্যাপ্টেন সরফুদ্দিন এবং সাবেক কৃষিবিভাগের পাইলট ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে ২/৩ জনের দাবি অনুযায়ী "বাংলাদেশ বিমান বাহিনী" নাম করণ করা হয় এবং তাঁদের প্ৰশিক্ষণ দেয়া হয়। মূলত তাঁরাই ভারত থেকে তাঁরাই বাংলাদেশে উড়ে এসে বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযান চালান। এই অপারেশন তাঁরাই কিলো ফ্লাইট নাম দেন। ভারত উপহার হিসেবে কিলো ফ্লাইটের সাফল্যর জন্য ছোট তিনটি পুরাতন বিমান দেয় - একটি ডাকোটা ডিসি-৩ পরিবহন বিমান, একটি ডি.এইচ.সি-৩ টুইন অটার পর্যবেক্ষণ বিমান ও একটি ঔষধ নিক্ষেপের কাজে ব্যবহৃত অ্যালুয়েট থ্রি হেলিকপ্টার।

ডিমাপুরের একটি পরিত্যক্ত রানওয়েতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর টেকনিশিয়ানরা উপহার পাওয়া বিমানগুলো রূপান্তর ও আক্রমণ উপযোগী করে তোলার কাজ শুরু করেন। ডাকোটা বিমানটিকে ৫০০ পাউন্ড বোমা বহনের উপযোগী করে তোলা হয়। টুইন অটারটির প্রতি পাখার নিচে ৭টি করে রকেট যুক্ত করা হয়। পাশাপাশি এটি ১০টি ২৫ পাউন্ড ওজনের বোমাও বহন করতে পারত যা একটি দরজা দিয়ে হাত দিয়ে নিক্ষেপ করতে হত। আর অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারের সামনে একটি .৩০৩ ব্রাউনিং মেশিন গান এবং দুই পাইলন থেকে ১৪টি রকেট নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়। এই ছোট বাহিনীকে কিলো ফ্লাইট নামকরণ করা হয়। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদকে কিলো ফ্লাইটের অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে।ওইদিন ক্যাপ্টেন আকরাম কর্তৃক পরিচালিত আক্রমণে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারির তেল ডিপো ধ্বংস হয়ে যায়।১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বিমান বাহিনী মৌলভীবাজারে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যারাকে হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পাকিস্তানিদের ঘাঁটিতে অনেকগুলো আক্রমণ পরিচালনা করে।

১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল থেকে সরকারি ঘোষণায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়।

**প্রশ্ন** : প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে জেনারেল ওসমানী যে কৌশল অবলম্বন করেন।

**উত্তর** : ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুলাই বাংলাদেশের সামরিক কমান্ড গঠিত হয়। এম এ জি ওসমানীকে মন্ত্রীপদমর্যাদায় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুর রবকে চিফ অফ স্টাফ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ এবং মেজর এ আর চৌধুরীকে সহকারী চিফ অফ স্টাফ ঘোষণা করা হয়।

যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ভারতীয় সেনানায়কদের সাথে জেনারেল ওসমানীর মতভেদ ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের নেতৃত্বে ৮,০০০ সদস্যের একটি প্রশিক্ষিত গেরিলা দল গঠন করা, যারা ছোট ছোট দলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হামলা চালাবে এবং যুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপের পথকে সুগম করবে। কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে জেনারেল ওসমানী ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন:

·         বাঙালি সেনারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কিছু এলাকা দখল করে নেবে এবং সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কূটনৈতিক স্বীকৃতি এবং হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানাবে। প্রাথমিকভাবে অভিযান শুরু করার জন্য ময়মনসিংহকে নির্বাচিত করা হলেও পরবর্তীতে জেনারেল ওসমানী সিলেটকে নির্বাচন করেন।

·         যত বেশি সম্ভব গেরিলা যোদ্ধাদের বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো, যারা কিছু নির্ধারিত কাজ করবে:

o    গেরিলা অভিযান ও আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষতিগ্রস্ত করা।

o    শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র, রেল ও সড়কপথ, পণ্য সংরক্ষণাগার প্রভৃতিতে আক্রমণ চালিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করা।

o    ব্রিজ/কালভার্ট, জ্বালানি তেলের গুদাম, ট্রেন ও জলযান উড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করা।

o    এই ধরনের কৌশলগত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি বাহিনীকে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা এবং বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীর ওপর আরও কার্যকরভাবে আক্রমণ চালানো।

**প্রশ্ন** : গেরিলা অভিযান/ যুদ্ধ কি ?

**উত্তর** : গেরিলা যুদ্ধ হল একটি অপ্রচলিত যুদ্ধের একটি রূপ যেখানে অনিয়মিত সামরিক বাহিনীর ছোট দল , যেমন বিদ্রোহী, পক্ষপাতিত্ব , আধা- সামরিক কর্মী বা সশস্ত্র বেসামরিক ব্যক্তিরা নিয়োগপ্রাপ্ত শিশুদের সহ , অতর্কিত হামলা , নাশকতা , সন্ত্রাস , অভিযান , ক্ষুদ্র যুদ্ধ বা হিট অ্যান্ড রান কৌশল ব্যবহার করে । একটি বিদ্রোহ , একটি সহিংস সংঘাতে , একটি যুদ্ধে বা গৃহযুদ্ধে নিয়মিত সামরিক , পুলিশ বা প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

**প্রশ্ন** : গেরিলা অভিযানের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল?

**উত্তর** : জুলাই মাসেই বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনী ছেড়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে গেরিলা অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া সামরিক কর্মকর্তাদের প্রতি সেক্টরে কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের জন্য মুক্তিবাহিনীর বাঙালি সৈন্যদের দুই থেকে পাঁচ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়। অধিকাংশ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল সীমান্তের নিকটবর্তী। এগুলো পরিচালনায় ভারত প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। জেনারেল ওসমানীর অধীনে নৌ-কমান্ডো এবং বিশেষ বাহিনী নিয়ে ১০ নং সেক্টর গঠন করা হয়। যুদ্ধের জন্য তিনটি ব্রিগেড, এগারোটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয় এবং প্রায় এক লক্ষ বাঙালিকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত করা হয়।

**প্রশ্ন** : মুক্তিযুদ্ধে জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসের কার্যকারিতা ।

**উত্তর** : জুলাই এবং সেপ্টেম্বর

জুলাই মাসেই বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়।

জুলাই এবং সেপ্টেম্বর মাসে তিন ব্রিগেড (আট ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্য এবং তিন ব্যাটারি গোলন্দাজ বাহিনী) সৈন্য যুদ্ধে পাঠানো হয়।জুন–জুলাই মাসে অপারেশন জ্যাকপটের উদ্দেশ্যে সীমান্তের দিকে মুক্তিবাহিনীকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ভারতের সহায়তায় ২০০০–৫০০০ জন গেরিলাযোদ্ধা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু “তথাকথিত” অতিবর্ষণ এবং অন্যান্য কারণে (যথেষ্ট প্রশিক্ষণের অভাব, সরবরাহব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগের অসুবিধা প্রভৃতি) মুক্তিবাহিনী কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারছিল না। বাঙালি নিয়মিত সেনারা ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেটের সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে আক্রমণ করতে থাকে। কোনো কোনো অভিযান সফল হলেও অনেকগুলো ব্যর্থও হয়। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ দাবি করতে থাকে যে তারা “মুনসুন অফেনসিভ” বা বর্ষাকালকে ঘিরে মুক্তিবাহিনীর পরিকল্পনা সফলভাবে অবদমন করতে পেরেছে। কর্তৃপক্ষের এই দাবি প্রায় সঠিক বলেই প্রতীয়মান হয়।

গেরিলা যোদ্ধারা প্রশিক্ষণকালে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও আগস্টের পর থেকে আবার সক্রিয় হতে শুরু করে। রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র ও সামরিক স্থাপনাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ঢাকার অভ্যন্তরে ক্র্যাক প্লাটুন কয়েকটি দুঃসাহসী অভিযান চালায়। এরপর ১৫ই আগস্ট অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে বড় সাফল্য আসে। নৌ-কমান্ডোরা এইদিন চট্টগ্রাম, মোংলা, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর বন্দরে নোঙর করা জাহাজে মাইন পেতে উড়িয়ে দেয়।

অক্টোবর–ডিসেম্বর

এই সময়ে মুক্তিবাহিনী সীমান্তঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ করে দখল করে নিতে থাকে। কামালপুর, বিলোনিয়া ও বয়রার যুদ্ধ এগুলোর মধ্যে অন্যতম। পাকিস্তানি বাহিনীর ৩৭০টি সীমান্তঘাঁটির মধ্যে ৯০টিই মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। পাশাপাশি গেরিলা বাহিনীর আক্রমণও আরও তীব্র হয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার বাহিনীও সাধারণ মানুষদের ওপর নির্যাতন করতে থাকে। এ অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আট ব্যাটালিয়ন সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয়। মুক্তিবাহিনী কিছুদিনের জন্য লালমনিরহাট ও সিলেটের শালুটিকর বিমানঘাঁটিও দখলে নিয়ে নেয়।[১৮] মুক্তিবাহিনী দুইটি বিমানঘাঁটিই ভারত থেকে ত্রাণ ও অস্ত্র আনায় ব্যবহার করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জরুরি ভিত্তিতে আরও পাঁচ ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আসা হয়।

**প্রশ্ন** : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ ।

**উত্তর** : “... সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তি, যারা বস্তুনিষ্ঠভাবে বাংলাদেশে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর পর যে নির্মম ঘটনা ঘটেছে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারা সে দেশের ৭৫ মিলিয়ন মানুষের বিদ্রোহের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাদের জীবন রক্ষার জন্য এ ছাড়া অন্য কোনো পথই খোলা ছিল না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের প্রশ্ন তো উঠছেই না” ---- রিচার্ড নিক্সনের প্রতি চিঠিতে ইন্দিরা গান্ধী, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, অর্থনৈতিকভাবে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ভার কাঁধে নেওয়ার চেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই বরং ভারতের জন্য অধিক উত্তম।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল ভারতীয় মন্ত্রীসভা সেনাসভাধ্যক্ষ জেনারেল শ্যাম মানেকশ’কে “পূর্ব পাকিস্তানের গভীরে” যেতে বলে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার বৈরী সম্পর্ক “পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে” ভারতের হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তকে আরও ত্বরান্বিত করে। ফলস্বরূপ ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীকে সমর্থন করে জাতিগতভাবে বাঙালিদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনে সমর্থন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র) পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহী বাঙালিদের সংগঠিত করে, প্রশিক্ষণ দেয় এবং অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করে। এই প্রশিক্ষিত গেরিলারা দেশের ভেতরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে এবং ডিসেম্বরের শুরুর দিকে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের সীমান্তবর্তী বিমানঘাঁটিগুলোতে অতর্কিতে হামলা চালায়। বিমানঘাঁটিতে থাকা ভারতীয় বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলোকে ধ্বংস উদ্দেশ্য নিয়ে এই আক্রমণ চালায়। ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর অপারেশন ফোকাসের আদলে এই হামলা চালানো হয়। ভারত এই হামলাকে স্পষ্টত তাদের দেশের ওপর আগ্রাসন হিসেবে দেখে এবং পাল্টা হামলা চালায়। এই হামলা-পাল্টা হামলার মধ্য দিয়ে উভয় দেশ সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনা ঘটে, যদিও কোনো দেশই আনুষ্ঠানিকভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিন কোর ভারতীয় সৈন্য অংশগ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর আরও প্রায় তিন ব্রিগেড সৈন্য এবং আরও অসংখ্য অনিয়মিত সেনা তাদের সহায়তা করে। এই সেনারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিন ডিভিশন সৈন্যের তুলনায় অনেক গুণ বড় ছিল। যৌথবাহিনী দ্রুত বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়তে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিগুলো দখল করে যৌথবাহিনী দ্রুত রাজধানী ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ ঠেকাতে সীমান্তের দিকে ছড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি সেনারা এত দ্রুত আক্রমণ সামাল দিতে পারেনি। যৌথবাহিনীর হাতে শীঘ্রই ঢাকার পতন ঘটে এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

ভারতীয় বিমানবাহিনী পাকিস্তানের বিপক্ষে একের পর এক আক্রমণ চালায় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে। ভারত ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যৌথ অভিযানে তেজগাঁও, কুর্মিটোলা, লালমনিরহাট ও শমসেরনগরে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ১৪ নং স্কোয়াড্রনের সমস্ত যুদ্ধবিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে প্রথম সপ্তাহান্তে বাংলাদেশের আকাশসীমার প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে সক্ষম হয়। আইএনএস বিক্রান্ত থেকে সি হক চট্টগ্রাম, বরিশাল ও কক্সবাজারে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তান নৌবাহিনীর পূর্ব শাখাকে ধ্বংস করে দেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সমুদ্রবন্দর দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান নৌবাহিনীর বিদ্রোহী কর্মকর্তা ও নৌসেনাদের নিয়ে নবগঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী জলপথে আক্রমণ চালাতে ভারতকে সহায়তা করে; বিশেষ করে অপারেশন জ্যাকপট বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**প্রশ্ন** : কত তারিখে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর এলাকায় অতর্কিতে হামলা করে?

**উত্তর** : ২০ মে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসররা খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর এলাকায় অতর্কিতে হামলা চালিয়ে মুক্তিকামী ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। একদিনে, একটিমাত্র জায়গায় এবং ঠাণ্ডা মাথায় যে বিপুলসংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়, তার নজির ইতিহাসে খুব বেশি নেই।

**প্রশ্ন** : কত তারিখে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ সংগঠিত হয়?

**উত্তর** : ১ আগস্ট ১৯৭১ সালে নিউ ইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে প্রায় ৪০,০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে সাবেক বিটল্‌স সঙ্গীতদলের লিড গিটারবাদক জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় সেতারবাদক রবিশঙ্কর কর্তৃক সংগঠিত হয় কনসার্ট ফর বাংলাদেশ।

**প্রশ্ন** : গেরিলা অপারেশন কখন থেকে পরিচালিত হয়েছিল?

**উত্তর** : ১৬ আগস্ট ১৯৭১ সালে অপারেশন জ্যাকপট বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নৌ-সেক্টর পরিচালিত সফলতম গেরিলা অপারেশন। এটি ছিল একটি আত্মঘাতি অপারেশন। এ অপারেশন ১৯৭১-এর ১৫ আগস্ট রাত ১২টার পর অর্থাৎ ১৬ আগস্ট প্রথম প্রহরে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর এবং দেশের অভ্যন্তরে চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরে একই সময়ে পরিচালিত হয়।

**প্রশ্ন** : ১৯৭১ সালে কত তারিখে যৌথ বাহিনী গঠন হয়?

**উত্তর** : ২১ নভেম্বর ১৯৭১ সালে ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে ‘যৌথ বাহিনী ’ গঠন ।

**প্রশ্ন** : ১৯৭১ সালে কত তারিখে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ করেছিল?

**উত্তর** : ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ। পাকিস্তানি বিমান থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে এয়ারফিল্ড গুলোতে বোমাবর্ষণ। ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ শুরু করে।

**প্রশ্ন** : ১৯৭১ সালে কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে?

**উত্তর** : ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ভুটান ও ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

**প্রশ্ন** : বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার পাকিস্তানের নীল নকশা তৈরির মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

**উত্তর** : ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে যৌথবাহিনীর আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন তারা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার নীল নকশা তৈরি করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, সাহিত্যিকদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। জাতির এ সূর্য সন্তানদের ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়।

**প্রশ্ন** : পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে ১৯৭১ সালের কত তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে ?

**উত্তর** : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের বিকেল ৪টা বেজে ৩১ মিনিটে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণ দলিলে সই করা হয়। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণপত্রে সই করেন জেনারেল নিয়াজি। আর ভারত এবং বাংলাদেশের মিত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণপত্র গ্রহণ করেন জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা। শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পথ চলা।

**প্রশ্ন** : পাকিস্তানের স্বাধীন বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণ এবং এর আত্মসমর্পণ এবং ফলাফল ।

**উত্তর** : ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্ব কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। আত্মসমর্পণের সময়ে কেবলমাত্র কয়েকটি দেশই বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। প্রায় ৯৩,০০০ যুদ্ধবন্দি যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বোচ্চ।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন সত্ত্বেও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীন বাংলাদেশের আবেদনে ভেটো প্রদান করে। পাকিস্তানের অপর মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এর অনেক পরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। যুদ্ধবন্দিদের স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সহজ করতে ভারত ও পাকিস্তান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাওয়ার বিনিময়ে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি নিশ্চিত করে।

ভারত যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে জেনেভা কনভেনশনের ১৯২৫ নম্বর নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে।[১৫০] মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ভারত ৯৩,০০০-এরও বেশি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দেয়। এছাড়াও সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে ভারত বাঙালিদের প্রতি যুদ্ধাপরাধের দায়ে বন্দি ২০০ জনের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করেন। এর পাশাপাশি ভারত যুদ্ধে দখল করে নেওয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩,০০০ কিমি২ (৫,০১৯ মা২) ভূমি পাকিস্তানকে ফেরত দেয়। তবে কার্গিলের মতো কৌশলগত ভূমি ভারত নিজের আয়ত্ত্বে রাখে, যা পরবর্তীতে, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, দুই দেশের মধ্যে আরেকটি যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয় এবং অনেকের মতে, এই চুক্তিটি ভারতের কূটনৈতিক ধীশক্তির পরিচয় বহন করে। আবার, ভারতের মধ্যেই কেউ কেউ মনে করেন, চুক্তিটি পাকিস্তানের প্রতি ভারতের অত্যধিক উদারতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের মতে, পাকিস্তানের ভঙ্গুর গণতন্ত্রের জন্য ভুট্টো চুক্তির বিষয়ে ভারতের প্রতি উদার হতে আহ্বান জানায়; এর অন্যথায় চুক্তিতে ভারত কঠিন শর্ত দিলে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারতো।